বামিয়ান বুদ্ধের সামনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

জাহিরুল হাসান

জন্মশতবর্ষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার লাইনে চট্টগ্রামের পর চতুর্থ স্টেশন ষোলোশহর জংশন। ওই ষোলোশহরেই জন্ম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর। জন্মতারিখ আমাদের স্বাধীনতা দিবসের সঙ্গে মেলে ১৫ আগস্ট। সালটা ১৯২২। পিতা সৈয়দ আহমদুল্লাহ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, শেষদিকে অতিরিক্ত জেলা হাকিম হয়েছিলেন। চাকরিতে ঘন ঘন বদলির ফলে পরিবারকে ঘুরতে হয়েছে নানান জায়গায়। ওয়ালীউল্লাহর পড়াশোনা বিভিন্ন সময়ে মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফেনী, ঢাকা, কুড়িগ্রাম এবং ময়মনসিংহের স্কুলে। এই ব্যাপক ভ্রমণের ফলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে সাধারণ শিশুর চেয়ে অনেক বেশি। একজন লেখকের মনোজগতের বিকাশে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলি খুবই মূল্যবান। যেমন, ময়মনসিংহে যখন তাঁরা থাকতেন প্রায় একটা মাজারের পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে হত, সেই সমাধির দৃশ্যই হয়তো লালসালু উপন্যাস লেখায় ইন্ধন জুগিয়েছে। বাংলার বিভিন্ন জেলা-উপজেলার স্থানীয় সংস্কৃতি ও উপভাষা তাঁর কল্পনা ও অভিব্যক্তিকে করেছে সমৃদ্ধ।

ওয়ালীউল্লাহ নিজের সময়ের চেয়ে যে

এগিয়ে ছিলেন, তা তাঁর কিছু টুকরো কথায় ধরা পড়ে। যখন তিনি ছাত্র, দর্শন হিসেবে পোস্টমর্ডানিজম তখনও আত্মপ্রকাশ করেনি। পরে আমরা জেনেছি, বৃহৎ আখ্যান মডার্নিজমের অঙ্গ, ক্ষুদ্র আখ্যান পোস্টমর্ডানিজমের। মেটা আর মিনি, দুই বিপরীত গঠন। ১৯৪২ সালে বন্ধুকে লেখা চিঠিতে ওয়ালীউল্লাহ কী সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যেন সেই অনাগত দর্শনের স্বরূপ। লিখছেন, 'সামান্য জিনিসই তো মানুষের চরিত্রের মূর্তিটি অপরের দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে সৃষ্টি করে তোলে। আনন্দভবন দান করাতে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েনি, সেটা চরিত্রের দিকই নয়। মতিলাল (নেহরু) যে ছেলের কারাগারের কষ্টটুকু রাত্রিতে মেঝেয় শুয়ে অনুভব করতেন, সেটাই তাঁর চরিত্র।' আবার, পারিবারিক সমস্যা তাঁর কাছে 'অতি সাধারণ ব্যাপার', এসব গায়ে মাখতে নেই। তিনি 'চিরমুক্ত'। যুবা বয়স থেকেই তাঁর মনে দর্শন ঢুকেছে, 'এই পৃথিবীতে আমরা সবাই একাকী আসি, এতে নিঃসঙ্গ যাত্রায় অন্যের মনের নিবিড় যোগাযোগ অমূল্য।' এইভাবে নিজের বাঁচার অর্থ খুঁজছেন তিনি, জেনে হোক বা না জেনে অস্তিত্ববাদের পথ ধরে। অস্তিত্ববাদ তখন নবাগত দর্শন এবং ওয়ালীউল্লাহর কিছু উপন্যাসে আলোচকেরা এই ইউরোপীয় দর্শনের ছায়া দেখতে পেয়েছেন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পূর্বাশা পাবলিশিং হাউস থেকে তাঁর প্রথম বই নয়নচারা বেরোয় ১৩৫১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের মার্চ-এপ্রিলে। মোট আটটি গল্পের সংকলন, নামগল্পটি সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত পূর্বাশা পত্রিকাতেই প্রথম ছাপা হয়েছিল। সেটিই সংকলনের প্রথম গল্প এবং তা শুরু হয়েছে এইভাবে, 'ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু মনের চরে যখন ঘুমের বন্যা আসে, তখন মনে হয় ওটা সত্যিই ময়ূরাক্ষী: রাতের নিস্তব্ধতায় তার কালো স্রোত কল-কল করে, দূরে আঁধারে তীররেখা নজরে পড়ে একটু-একটু, মধ্যজলে ভাসন্ত জেলেডিঙিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বংসহা আশার মতো মৃদু-মৃদু জ্বলে।' একটু চিত্রধর্মিতা আছে। তবে প্রথম অনুচ্ছেদের পরে গল্প প্রবেশ করেছে কঠোর বাস্তবে। দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষ দুপুরে লঙ্গরখানায় সামান্য খেয়ে রাতে আর কোনো খাবারের আশা না করে শহরের ফুটপাথে শয্যা নেয়। শহরে শুয়েও গ্রাম থেকে আসা মানুষ গ্রামেরই দৃশ্য দেখে। আর দেখে আশপাশে সাজানো খাবার। তারা এসেছে নয়নচারা গ্রাম থেকে। না খেয়ে মানুষ তখন মরছে দলে দলে। গল্প লেখায় ওয়ালীউল্লাহ সেই সময়ের গতানুগতিক ধারাকে অনুসরণ করেননি, তিনি গল্প বলেছেন অনুচ্চ কণ্ঠে। চরিত্র নয়, মন লেখেন তিনি— আহত মন, ক্ষুধিত মন। সব মিলিয়ে এক শিল্পিত সৃষ্টি। যা পড়লে গুম হয়ে থাকতে হয় কিছুক্ষণ।

১৯৪৫ সালে প্রথম বই আর ওই বছরই দু'-তিন মাসের ব্যবধানে হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো ১৮ জুন ১৯৪৫ পিতৃবিয়োগ। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর কারণে পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব তাঁদের দুই ভাইয়ের ওপর এসে পড়ে, অগত্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ অসমাপ্ত রেখে চাকরি নিতে বাধ্য হন। প্রথম চাকরি কলকাতায় দ্যা স্টেটসম্যান পত্রিকায় সাব-এডিটর পদে। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তখন ওই পত্রিকার আসিস্ট্যান্ট এডিটর। পরে বিদেশে বাসকালে সুধীন্দ্রনাথের স্ত্রী রাজেশ্বরী দত্তের সঙ্গে পরিচয় গাঢ় হয়। কলকাতায় থাকতেন পার্ক সার্কাস অঞ্চলে। তাঁর ওই সময়ের বিভিন্ন চিঠিতে ঠিকানা পাওয়া যায় ১ বালু হাক্কাক লেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে বাস করতেন বন্ধু আহমেদুল কবির, তাঁর চেয়ে বছরখানেকের ছোটো। ছাত্রজীবনের বন্ধু ও ফ্ল্যাটসঙ্গী হলে কী হবে, কথাবার্তা খুব কম হত। চাপা স্বভাবের মানুষ ছিলেন ওয়ালীউল্লাহ। চালচলনে সাহেবিয়ানা, স্বভাব-অভিজাত। কিন্তু আত্মসমাহিত ও নিভৃতচারী। বলতেন, 'কোনোরকম উচ্ছ্বাস আমার ভালো লাগে না, ভাবালুতা তো নয়ই।'

দেশভাগ হওয়ার পরপরই দ্যা স্টেটসম্যান-এর চাকরি ছেড়ে ঢাকায় চলে যান এবং সেপ্টেম্বর মাসে রেডিও পাকিস্তানে বার্তা বিভাগের সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দেন। অফিসে কাজ কম ছিল। নাজমুদ্দীন হাশেম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে

যেতেন রেডিওতে। তিনি জানিয়েছেন, 'সমস্ত অবসর সময়টি তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন সৃষ্টিশীল প্রয়াসের নিমিত্তে।' অবসরের ফাঁকে লিখতে শুরু করেন তাঁর সবচেয়ে পঠিত রচনা লালসালু। অনেকদিন ধরে লেখালেখির মধ্যে থাকলেও, ঢাকায় প্রকাশক জোটাতে পারেননি বইটি ছাপার জন্য, তাই মনস্থ করলেন নিজেই ছাপবেন। পুরোনো পারিবারিক সংস্থা কমরেড পাবলিশার্সের নামে ১৯৪৮ সালে বইটি বেরোয়। প্রথম প্রকাশের পর লালসালু বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু বারো বছর পরে কথাবিতান থেকে যখন দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ পায়, পাঠক ও সমালোচকদের অনেকেই তখন একে দেশভাগের পরে লেখা পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বরণ করে নিতে ভুল করেননি। সাত বছরের মধ্যে আরও তিনটি মুদ্রণ।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ও মুসলমান হিসেবে গর্ব বোধ করত।' তা হলেও, লেখক হিসেবে তিনি নির্বিশেষ, সর্বজনীন মানবতার প্রতিনিধি।

করাচি কেন্দ্রে বার্তা-সম্পাদক হয়ে ওয়ালীউল্লাহ ঢাকা ছাড়েন লালসালু প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই। করাচির অবিবাহিত জীবন উপভোগ করেছেন। এ সময়ে বিভিন্ন পর্বে ইতালীয় তরুণী ক্যাসাবিয়াঙ্কা এবং উর্দু লেখিকা বুররাতুন আয়েন-এর সঙ্গে রোমান্টিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর। কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ নয়াদিল্লি বদলি হওয়ায় সম্পর্কগুলি আর এগোয়নি। ১৯৫২ সালে দিল্লি থেকে বদলি হয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে এবং সেখানেই হবু স্ত্রী আন মারির সঙ্গে পরিচয় ও প্রণয়। ১৯৫৪-য় অল্প সময়ের জন্য ঢাকার আঞ্চলিক তথ্য দফতরে

প্রথম চাকরি কলকাতায় দ্যা স্টেটসম্যান পত্রিকায় সাব-এডিটর পদে। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তখন ওই পত্রিকার আসিস্ট্যান্ট এডিটর। পরে বিদেশে বাসকালে সুধীন্দ্রনাথের স্ত্রী রাজেশ্বরী দত্তের সঙ্গে পরিচয় গাঢ় হয়। কলকাতায় থাকতেন পার্ক সার্কাস অঞ্চলে।

ততদিনে ওয়ালীউল্লাহ শুধু এই বইটির জন্যই পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এ এক সার্বভৌমিক সার্বকালিক উপন্যাস। দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ধর্মকে আঁকড়ে ধরতে চায় মানুষ অলৌকিক উদ্ধারের আশায়। তাই নিয়ে যেন পরিহাস উপন্যাসকারের বয়ানে, 'শস্যের চেয়ে টুপি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোরবেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতালার বিশেষ দেশ। ন্যাংটা ছেলেও আমসিপারা পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবির বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়ে। গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফজ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন-একটা ভাব জাগে। হাফেজ তারা। বেহেশতে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।' স্ত্রী আন মারির বিশ্বস্ত সাক্ষ্য, 'ওয়ালী ছিল অবিশ্বাসী, কিংবা বলা যায় অজ্ঞেয়বাদী। তবে

নিয়োগ, পরের বছর ফের করাচিতে তথ্য মন্ত্রণালয়ে বদলি হয়ে যান। সেখানেই ৩ অক্টোবর ১৯৫৫ বিয়ে হয় আন মারির সঙ্গে, স্থানীয় সমাজের বাধ্যবাধকতা মেনে স্ত্রীর ধর্মপরিবর্তন করে। তবে সেটা শুধু বিয়ের চুক্তিপত্রেই থেকে গিয়েছিল। দু'জনের কেউই তা পালন করেননি, আন মারির পুরোনো নাম রেখে দেওয়া থেকেও সেটা বোঝা যায়।

১৯৬১-তে বদলি হয়ে আসেন শ্বশুরবাড়ির দেশ ফ্রান্সে এবং তারপর এক নাগাড়ে প্যারিসে। শেষ নিযুক্তি দূতাবাসে প্রথম সচিব হিসেবে। ১৯৬৭ সালে বিদেশ দফতরের চাকরি থেকেই ইউনেস্কোর চুক্তিবদ্ধ পদে যোগদান তিন বছরের জন্য, ওই প্যারিস শহরেই। মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার তাঁকে ইসলামাবাদে বদলির প্রস্তাব

দিয়েছিল। কিন্তু তিনি রাজি হননি। তখন পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে একটা রাজনৈতিক বিরোধ ক্রমশ ঘনিয়ে উঠছে। পরের বছর ১৯৭১-এ শুরু হবে মুক্তিযুদ্ধ। হয়তো সেসব আঁচ করেই থেকে গেলেন প্যারিসে। সরকারি ইচ্ছা অমান্য করার মাশুল চুকোতে হয় ২২ বছর সরকারি চাকরির শেষে প্রাপ্য যাবতীয় সুবিধা খুইয়ে। এরপর গোটা এক বছরও স্থায়ী হয়নি বাকি জীবন। সে জীবন কষ্টের, একদিকে দেশে অনিশ্চয়তা-অস্থিরতা, অন্যদিকে বেকার উপার্জনহীন তিনি। ১০ অক্টোবর ১৯৭১ গভীর রাতে পাঠরত অবস্থায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন দুই বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। রেখে গেলেন প্রেমময়ী স্ত্রী আন মারি এবং দুই সন্তান কন্যা সিমিন ওয়ালীউল্লাহ ও পুত্র ইরাজ ওয়ালীউল্লাহকে। মৃত্যুর সাত মাস পরে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর স্ত্রীকে পাঠানো শোকবার্তায় বলেন, 'আমাদের দুর্ভাগ্য যে মিস্টার ওয়ালীউল্লাহর মাপের প্রতিভার সেবা গ্রহণ থেকে মুক্ত বাংলাদেশ বঞ্চিত হল। আমাকে এটুকু বলার সুযোগ দিন যে আপনার ব্যক্তিগত ক্ষতি বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও ক্ষতি।'

চল্লিশের দশকে সেই দু'টি বই, তারপর পঞ্চাশের দশকে কোনো বই ছাপা হয়নি তাঁর। পরিণত বয়সে জীবনের শেষ ও সর্বাধিক সৃজনশীল দশক ষাটে এসে দিয়ে গেলেন মিশ্র ফসল উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক মিলিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত আরও ছ'খানি বই। পঁয়তাল্লিশ সালে বেরিয়েছিল প্রথম বই এবং শেষেরটি আটষট্টিতে। এর একটি গল্প-সংকলন, অন্যটি উপন্যাস। ওয়ালীউল্লাহর তিনটি উপন্যাসের মধ্যে সর্ববৃহৎ 'কাঁদো নদী কাঁদো'। 'লালসালু'-র পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১৬, 'চাঁদের অমাবস্যা'-র ১৮০, 'কাঁদো নদী কাঁদো'-র ২৬২। শুধু তা-ই নয়, তৃতীয়টি আবদুল মান্নান সৈয়দের বিচারে 'আমাদের' অর্থাৎ ওপার বাংলার 'জটিলতম উপন্যাস'। বিয়ের আগে ১৯৫৪ সালে আন মারিকে দেওয়া চিঠিতে নিজের লেখালেখি সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন, 'আমার লেখা বই, আমার নাটক, আমার গল্পগুলো ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ফোটোগ্রাফিক প্রতিফলন নয়, বরং এগুলো তার চেয়ে বেশি কিছু।'

দেশের বাইরে জীবন কাটানোর জন্যই হয়তো জীবিতাবস্থায় ওয়ালীউল্লাহ লেখক হিসেবে উপযুক্ত স্বীকৃতি পাননি। কিন্তু তাঁর অকালপ্রয়াণ ও বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর তাঁর সম্পর্কে বিদ্বৎসমাজে ক্রমশ আগ্রহ বেড়েছে। কিন্তু একই বাংলা ভাষার শরিক হয়েও পশ্চিমবঙ্গে ওয়ালীউল্লাহচর্চা যেমনটি হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি, হয়তো ভৌগোলিক দূরত্বের কারণেই। সেই অভাব পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ এসেছে এখন। ওয়ালীউল্লাহ জন্মশতবর্ষ চলবে ১৪ আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত। আমরা কি তৈরি?

উপবাস ও দারিদ্র্য

বই লিখিয়া টাকা নাই হইল! যে না লিখিয়া থাকিতে পারিবে না সেই লিখিবে, যাহার টাকা না হইলে চলে না সে লিখিবে না। উপবাস ও দারিদ্র্যের মধ্যে সাহিত্যের মূল পত্তন, ইহা কি অন্য দেশেও দেখা যায় না! বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া কি কুবেরের ভাণ্ডার লুঠ করিয়াছিলেন?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমাজ, একটি পুরাতন কথা ৭